Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 295 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 295 - 305
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌড়ীয় শিল্প-ভাবনা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. তপন ঘোষ
সহশিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ
বালকী উচ্চতর বিদ্যালয়
Email ID: tapanghosh1979@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Archaeology, historiography, Gaudrajya, Chaitanya Period, Gaudiya art, Pala regime, Sena Period, litterateur.

Abstract

Rakhaldas Banerjee is a brilliant figure in 20th century Indian history. The discovery of Mohenjodaro brought his worldwide fame. In addition to various archaeological activities, his contribution in uncovering the past art history of the country is undeniable. In the initial phase, Western writers played the role of pioneers in uncovering various aspects of the history of ancient India. Pursuing their initiative, the Indian scholars vowed to restore the history of their country. Rakhaldas Banerjee's inner heart was enlightened by the Indian Scholars. As a result, he flourished the world of Indian art historiography and Gaudiya art philosophy.

After the fall of the Gupta empire, two kingdoms named Gaur and Banga emerged, Gaur kingdom was formed with North Bengal and West Bengal in general and Bengal or Samatata kingdom was formed with parts of East and West Bengal. Sometimes South Bengal was included in the Gaur kingdom. But Rakhaldas thinks that all the provinces from the foothills of Himachal to the Bay of Bengal were called 'Gaudesh' or 'Gaudrajya' till the twelfth century. Immediately after the rise of the Pala administrative system in the mid-eighteenth century, a new style of art developed in Bangladesh, known as Gaudiya Art. In addition to greatly expanding in the neighbouring states this style of art spread its influence and gave rise to different styles of art. Rakhaldas Bandyopadhyay referred to the art style of the Chaitanya period as enlightened by the spirit of Vaishnavism as the 'art of the Indian genre'. But the progress of this 'art genre' was not uniform.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 295 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Although this art developed its own genre within a short period of time, Gaudiya art lost much of its luster due to the anarchic situation created after Shashanka's death. The political stability brought about by the establishment of the Pala regime in the mid-8th century led to the flourishing of Gaudíya art. However, this art began to decline during the Post-Devapal period. In the second phase of the art i.e. from the 10th to the 11th century, this art did not flourish but progressed through various changes. In the Sena period, the slender body of the statue was replaced by fleshy fat, which made it quite different from the earlier period. A swoon of pure poetic exhilaration took place in the statue's body, but it was only momentary. Its artistic glory was destroyed by the invasion of foreign powers. There is no denying that Rakhaldas Banerjee paved the way for Indian art practice, which was later followed by many artists and Indian litterateurs. As a result, Indian and Bengali history and literary fields were enriched.

Discussion

বিশ শতকের মনীষাদীপ্ত ঐতিহাসিক কর্মবৃত্তে যে কয়জন বাঙালি চিন্তক আপন কীর্তির মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, মহেনজোদারোয় খননকার্যের ফলে সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার রাখালদাসের জগৎজোড়া খ্যাতির মৌল কারণ। রাখালদাস তাঁর সমগ্র জীবনে আর কিছু না করলেও শুধুমাত্র এই একটিমাত্র কারণেই তাঁর আসন খ্যাতির শীর্ষে আসীন হওয়া উচিৎ। কেননা এই খননকার্যের ফল আজ সুবিদিত, পাঁচ হাজার বছরের পুরানো ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের অন্যান্য সমকালীন সভ্যতাগুলির সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং মহেঞ্জোদারো হরপ্পায় এমন এক উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল যা সমসাময়িক সুমেরীয় নগর সংস্কৃতির সমকক্ষ এবং ব্যাবিলনীয় ও মিশরবাসীদের অনুরূপ জীবনের চেয়ে অনেক ভালো।[১] তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে ঔপনিবেশিক সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যেমন প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, তেমনি প্রাচীন ভারতের অতীত গরিমা ও ঐতিহ্য উদ্ধারের কাজে রাখালদাস আরো মনযোগী হয়েছিলেন। কেবলমাত্র ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব নয়, রাখালদাস পুরালেখবিদ্যা, প্রাচীন লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাবিদ্যার ক্ষেত্রেও অলোকসামান্য নৈপুণ্যের পাশাপাশি প্রাচীন মূর্তিতত্ত্ব ও শিল্প-ইতিহাসেও তাঁর স্বর্ণহাতের ছোঁয়া রেখেছেন। স্বদেশবৃত্ত-চর্চায় একটি দোলায়িত সময়ের আবর্তে অর্থাৎ পশ্চিমী পণ্ডিতবর্গের ভারতনিন্দা ও স্বাজাত্য-দর্প এবং অন্যদিকে বিদেশী ভারতবিদ্যা পথিকদের গৌরবময় অতীত ব্যাখ্যান– এই দুই-এর টানাপোড়নের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ভারতবর্ষের প্রণালীবদ্ধ আনুপূর্বিক ইতিহাসচর্চার তখন কম্পমান অবস্থা। কারণ তখন ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় তথ্যের অপ্রতুলতা, যুক্তিসঙ্গত কাঠামোর অভাব, সর্বোপরি প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত রচনাশৈলীর অনুপস্থিতি।

এই রকম কোরাশূন্যতার আবহে সাধারণভাবে ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক উন্মোচনে প্রতীচী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাই পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমকালীন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের আনুপূর্বিক ইতিহাসচর্চার প্রয়াসের জন্য প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে ভারতবাসীর ঋণ অনস্বীকার্য। ১৭৮৩ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর মত বিদেশী ভারতবিদ্যা বিশারদদের ভারতবর্ষে আগমণ এবং ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারতেতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে দুটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এই দুটি ঘটনাই ভারত-সন্ধিৎসার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। স্যার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন ভারতবর্ষের উন্নত সভ্যতায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবনত, তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ভারতের প্রাচীনত্ব তথা ভারতবিদ্যা গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এককথায় প্রাচ্যবিদ্যার ভাণ্ডার উন্মোচিত করলেন উইলিয়াম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 295 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪), চার্লস উইলকিনস (১৭৪৯-১৮৩৬), হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০), হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭), জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০), আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪-১৮৯৩), ফ্রীডরিখ ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০), ইউজীন বুর্নুফ (১৮০১-১৮৫২), মনিয়ার উইলিয়ামস (১৮১৯-১৮৮৯) প্রমুখ মনীষী। ১৭৮৮ সালে এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে গবেষণার ফসলবাহী 'এশিয়াটিক রির্সাচেস' পত্রের আত্মপ্রকাশ এই সারস্বত প্রমাণ রাখল যে, এশিয়া মহাদেশের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সংস্কৃতি আছে এবং তা প্রাচীন বলেই পর্যাপ্ত গবেষণার বিষয়ীভূত। এরপর থেকে প্রত্ন-উপাদান সংক্রান্ত গবেষণা এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসূচির অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। দিনে দিনে সোসাইটির প্রত্ন-উপাদান সংগ্রহ-সংখ্যা বাড়তে থাকায় প্রয়োজন হল একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার; যা বাস্তবরূপ পেল ১৮১৪ সালে। কিন্তু সোসাইটির জন্মলগ্নে বা প্রাথমিক পর্বে রামমোহন রায় বা রাধাকান্ত দেবের মত কোন ভারতীয় বিদ্যোৎসাহীকে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে দেখা যায় না। এমনকি পরবর্তী সময়েও তাঁরা প্রতিষ্ঠানের এই বিরাট কর্মযজ্ঞ থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। তবে ১৮২৯ সালে প্রথম পাঁচজন ভারতীয় এই সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, শিবচন্দ্র দাস ও রসময় দত্ত। এঁদের মধ্যে একমাত্র রামকমল সেন ছাড়া আর কেউই, বিদ্যোৎসাহী হলেও, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের অধিকারী হননি।[২] তাই এইসব বিদেশী প্রাচ্যবাসীদের কাছ থেকে ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস শোনা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। অপরপক্ষে জোন্স ও সহকারীদের বিপরীত মেরুতে ছিলেন জেমস মিল, উইলিয়াম ওয়ার্ড, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ একশ্রেণির প্রতীচী লেখক, যাঁরা ছিলেন আত্মতুষ্ট, অহংদৃপ্ত। ভারতবর্ষের মত একটা অসভ্য দেশকে তাঁরা সভ্য করেছেন নানাভাবে- এই কথাটার প্রচারপাতেই তাঁদের সমস্ত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের এই উচ্চমন্য দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয়দের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার করলো এবং সেই বিরক্তির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই স্বদেশপ্রেম উন্মীলিত হল।[৩] তাই নতুনভাবে দেশের ইতিহাস পুর্নগঠন, শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশে স্বদেশচেতন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এই সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ। এই সময় ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করতে আত্মপ্রকাশ করল– 'কোয়ার্টার্লি জার্নাল' (১৮২১), 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' (১৮২৯) এবং 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৮৩২)। নতুন আবিষ্কার ও মূল্যবান ধারণা-সিদ্ধান্তে দেদীপ্যমান এই পত্রিকা ক'টি, ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করল।[৪]

এই ভাবে প্রতীচ্য মনীষীদের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ স্বদেশের ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। রাখালদাসের মনোজগৎ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে স্বাদেশিকতার আদর্শে প্রাণিত পূর্বজ এই সব ইতিহাসবিদ ও মনীষীদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। রাখালদাস প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করতে চাইলেন সেই 'প্রাণরস', যা জাতীয় চেতনার নবোদিত অঙ্কুরকে মহীরুহে পরিণত করতে পারে। এই 'প্রাণরসের'ই অনুষঙ্গ হিসাবে তিনি উন্মোচন করলেন ভারতশিল্পের ইতিহাসচর্চা। এই ইতিহাসচর্চার আদিপর্বে অন্যদের সঙ্গে রাখালদাসও এগিয়ে এসেছেন তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি, বিশ্লেষণী মন ও কুশলী কলম নিয়ে। আবিষ্কার করেছেন মধ্যপ্রদেশের (পূর্বতন সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস-এর নাগোড় দেশীয় রাজ্যের) ভূমারার শিবমন্দির, বিহারের রাজাওনা আর উত্তরপ্রদেশের কোসাম (প্রাচীন কোসাম্বী) অঞ্চল। আর এগুলির ভাস্কর্য নিদর্শন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, সবশেষে লিখেছেন তাঁর শিল্পকলা বিষয়ক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত গবেষণার ফসল *'Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture'*।[৫] গ্রন্থটি রাখালদাসের শিল্প-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সারস্বত অভিজ্ঞান। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি যদি মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার নাও করতেন, তবে শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই রাখালদাস শিল্প-প্রাজ্ঞ হিসাবে অমর হয়ে থাকতেন।

রাখালদাস স্বদেশী শিল্পেতিহাস চর্চার অনুষঙ্গ হিসাবে গৌড়ীয় শিল্পভাবনার জগৎকে উন্মোচিত করেছেন। সেই সময় বিভিন্ন দিক দিয়ে ভারতেতিহাস চর্চার ডাঙা জাগতে শুরু করেছে। রাখালদাসও সেই স্বদেশচেতন বাঙালি সমাজের একজন সার্থক কর্মযোগী হয়ে ওঠেন। স্বদেশচেতনার উত্তুঙ্গ আবহে নতুন আঙ্গিকে দেশের ইতিহাস পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের

তিনি বলিষ্ঠ রূপকার। বস্তুতঃ ভারত-ইতিহাস ও ভারত-সংস্কৃতির এমন কোন দিক এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে রাখালদাস ভাবেননি, কিছু না কিছু লেখেননি।[৬] শিল্প-ইতিহাসে রাখালদাসের বৈদগ্ধতা ও কর্মৈষণা প্রশ্নাতীত। তাঁর শিল্প-বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান রচনা ও মাতৃভাষায় গৌড়ীয় শিল্প-সংক্রান্ত লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বাঙালির স্বদেশচেতনা ও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার দ্যোতনাবাহী।

অতীত-সন্ধিৎসা ও পুরাকীর্তির মগ্নপাঠে রাখালদাস যুক্ত হয়েছিলেন ছাত্রাবস্থাতেই। ১৯০৯ সালে ইতিহাসে এম. এ. পাশের পরেই এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ‘বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন’ নিয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালে তিনি কোলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে ‘প্রত্নতাত্ত্বিক সহকারী’ হিসাবে নিযুক্ত হন এবং এখানেই তিনি থিয়োডোর ব্লখের সংস্পর্শে আসেন তাঁরই শিক্ষাগুরু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সৌজন্যে। প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও রাখালদাসের জীবনে প্রভাব-সঞ্চারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, থিয়োডোর ব্লখ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। ছাত্রাবস্থায় রাখালদাসের প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র সংগ্রহ ভাণ্ডারকরের উচ্চসিত প্রশংসা পেয়েছিল। ব্লখের কাছ থেকে তিনি প্রত্নবিদ্যা ও ইতিহাস গবেষণার পাশ্চাত্য পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও তাঁর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন এবং ত্রিবেদী মহাশয়ের নির্দেশে তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্বদেশ-সন্ধিৎসু তরুণ রাখালদাসের মনে ভারতবর্ষের গৌরবান্বিত অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর অনুরাগ সৃষ্ট করেন। এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশের মানস-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়।[৭] ১৯১০ সালে জাঁ ফিলিপ ফোহেল রাখালদাসকে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের নির্দশনগুলির তালিকা তৈরী করার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করেন। তালিকা প্রণয়নের সময় মিউজিয়ামের কয়েকটি নিদর্শনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং তাদেরকে উপজীব্য করে তিনি শিল্প বিষয়ক একটি ছোট নিবন্ধ পাঠান প্রত্নতত্ত্বের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে। ১৯০৯-১৯১০ সালে নিবন্ধটি *‘Some Sculpture in the Lucknow Museum’* নামে প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর শিল্পকলা বিষয়ক প্রথম রচনা।

থিয়োডোর ব্লখের প্রণোদনায় ১৯০৪ সাল থেকে রাখালদাস ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংগৃহীত ভাস্কর্যগুলি নিয়ে অধ্যায়ন শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর মধ্যে বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত লেখযুক্ত মূর্তিগুলি নিয়ে লেখালিখির ভাবনা জাগরুক হয়, যার পরিণতিতে রাখালদাস গৌড়ীয় শিল্প নিয়ে সাতটি নিবন্ধ রচনা করেন। এগুলি হল- ‘শিল্পের আদর্শ’, ‘গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস’, ‘গৌড়ীয় শিল্পের আদিযুগ’, ‘দশম শতকে গৌড়ীয় শিল্প’, ‘গৌড়ীয় শিল্পের পুনরুত্থান’, ‘গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য প্রভাব’, ও ‘দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প’।

প্রতিটি শিল্পের উদ্ভব হয় একটি আদর্শ থেকে। এই আদর্শ হল ‘Ideal’ কিন্তু কখনো ‘Model’ নয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিল্প থাকলেও ঔপনিবেশিক যুগে তার ব্যবহার ছিল না। তখনকার সময়ে শিল্প বলতে বোঝা হত ‘Craft’, আর শিল্পী ছিল ‘Craftman’ অথচ এখন শিল্প বলতে ‘Art’ বোঝায়- ‘Craft’ নয়। ‘Art’ এর অন্তর্ভূক্ত ছিল প্রধান দুটি বিষয়- আলেখ্য আর তক্ষণ। আলেখ্য হল ছবি আঁকা আর তক্ষণ হল ভাস্কর্য বা খোদাইয়ের কাজ। ভাস্কর যখন একটা আদর্শ নিয়ে সেই ছাঁচে বেচবার জন্য হাজার হাজার মূর্তি গড়ে তখন তার কলাবিদ্যাটা ‘শিল্প’ হয়ে ওঠে। তেমনি চিত্রকর যখন একটা আদর্শের একটা ভালো ছবি আঁকেন এবং তার পরে একই ছবির দশখানা নকল করে বিক্রি করেন তখন তাও কতটা শিল্প হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ সে ‘Artist’ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে, ‘Craftman’ হিসাবে নয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালেও এই ‘Art’ এবং ‘Craft’ এর সহাবস্থান ছিল। কিন্তু দেশে জাতীয় জীবনের বিকাশের সাথে সাথে এই আদর্শের বিকৃতি এসে যায়।

শিল্প হল একটি মানসিক সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের পরিকল্পনা কোন জাতির মানসিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। অতি প্রাচীনকালে মিশর দেশের লোকেরা মনের মতো আদর্শ ঠিক করে চিত্রে বা মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলতো। মিশরের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 295 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনুকরণে একদিন প্রাচীন গ্রীস নিজেদের শিল্পের আদর্শ গড়েছিল। পাশ্চাত্য জগতের কাছে সেই শিল্পাদর্শই বড় সুন্দর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ এই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। রাখালদাস ভারতীয় শিল্পের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন-

> "আমাদের দেশে শিল্প প্রাণহীন, নকলেও বাহাদুরি নেই এবং চুরি পদে পদে ধরা পড়ে যায়। তার কারণ যাঁরা শিল্পচর্চা করেন তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে বলেন, আদর্শের অভাব।"[৮]

ভারত-ইতিহাস পুনর্গঠনের মত শিল্পেতিহাসের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য লেখকদের গবেষণা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। গবেষণায় দিশা দেখানোর পাশাপাশি এইসব অকৃত্রিম ও বিস্ময়কর শিল্পগৌরবের মূর্চ্ছনা বাঁচিয়ে রেখেছেন আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, জে. ডি. এম. বেগলার, জেমস বার্জেস, এ. এইচ. লংহার্স্ট, স্যার জন মার্শাল, ও রবার্ট সিউয়েলের মত প্রত্ন-প্রাজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ। এঁদের অনুসৃত পথে শিল্পচর্চার ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হলেও বাংলা দেশে শিল্প-ইতিহাসের চর্চা একেবারে নবীন নয়, তা বেশ প্রাচীন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎকুমার রায়, ননীগোপাল মজুমদার, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ বাঙালি পণ্ডিত বঙ্গদেশের প্রাচীন শিল্প-গৌরবের ইতিহাসচর্চা করেছেন। এঁদের প্রদর্শিত পথেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৌড়ীয় শিল্পের চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস ছাড়া বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস অসম্পূর্ণ। আবার বাঙলার স্থানিক ইতিহাসের মতো ছোট ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বৃহৎ ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাসের ভাবনা কষ্টকল্পনামাত্র। তাই রাখালদাস গৌড়ীয় শিল্পকে ভারতীয় ইতিহাসের গোত্রভুক্ত করলেন নির্দ্বিধায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে দুটি রাজ্যের পত্তন হয়। সাধারণভাবে উত্তর বাংলা ও পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে গৌড় রাজ্য গঠিত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার অংশ বিশেষ নিয়ে বঙ্গ বা সমতট রাজ্য গঠিত হয়। কখনো কখনো দক্ষিণবঙ্গও গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তবে উভয় রাজ্যের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা ছিল না। পুন্ড্র, সুহ্ম, সমতট এই সময় থেকে বিলুপ্ত হয় এবং বাংলার গৌড় ও বঙ্গ এই নামই এর পর থেকে প্রচলিত হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

> "গৌড় কোন প্রদেশের নাম হইলেও বাংলাদেশের কোন অংশ ঐ যুগে গৌড় নামে অভিহিত হইত তা নির্ণয় করা যায় না। খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ প্রথমে গৌড়-বিষয় (জিলা) নামে পরিচিত ছিল এবং এই বিষয়টির নাম হইতেই গৌড়দেশ এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।"[৯]

তবে রাখালদাসের মতে,

> "গৌড় দেশ বলিলে পূর্বে কেবল উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ বুঝাইত, কিন্তু খ্রিষ্টের জন্মের আটশত নয়শত বৎসর পর হইতে মগধ, অঙ্গ, তীরভুক্তি, মিথিলা, বাঢ়, বরেন্দ্র, বকদ্বীপ, হরিকেল্ল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নাম ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে প্রায় মুছিয়া গেল। এই সমস্ত নামগুলি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিত বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোক শোন-তীর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এবং হিমাচলের পাদমূল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশগুলিকে খ্রিষ্টাব্দের দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গৌড়দেশ বা গৌড়রাজ্য বলিয়াই জানিত।"[১০]

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে নতুন একধরনের শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। এই নতুন শিল্পরীতি 'গৌড়ীয়রীতি নামে পরিচিত। সর্বপ্রথম এই 'গৌড়ীয় শিল্পরীতি' আবিষ্কারের দাবী জানিয়েছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। কিন্তু সেই সময় গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় গৌড়ীয় শিল্পের ক্রমবিকাশ ও বিস্তার সম্পূর্ণভাবে ধরা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক পর্বে এই শিল্পরীতি গৌড়দেশে ব্যাপকভাবেই শুধু বিস্তারলাভ করেনি, তা আশেপাশের বহু রাজ্যের শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতির জন্ম দিয়েছিল। গৌড় চেতনার প্রবাহধারায় যে শেষ উচ্ছ্বাস মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই আখ্যার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সুপ্রাচীন কাল থেকে সেই চেতনাই পূর্ব-ভারতে একটি সুনির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংস্কৃতির বিবর্তনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১১] রাখালদাস এই শিল্পধারাকে পূর্বভারতীয় ঘরানার শিল্প বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর *'Eastern Indian school of Mediaeval Sculpture'* নামক মহাগ্রন্থে। এই গ্রন্থটি বাংলা ও বিহারের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য নিয়ে লেখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে রাখালদাস এই মহাগ্রন্থের একটি বাংলা রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রবাসীতে গৌড় দেশের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 295 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসের বাংলা সংস্করণ প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন। এই ভাবনার পেছনে ছিল রাখালদাসের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ।[১২] গান্ধারের যবন বা গ্রীক রাজাদের সময়ে, মথুরায় শক ও কুষাণ রাজাদের সময়ে যেমন নতুন শিল্পরীতির উদ্ভব হয়েছিল, তেমন বৃহত্তর গৌড়দেশে গৌড়ীয় শিল্পরীতি নামক নতুন শিল্পের উদ্ভব হয়। এই শিল্পরীতি পশ্চিমে শ্রাবস্তী (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা ও বাহরাইচ জেলা) ও পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। খ্রিষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে মথুরা শিল্প মালবের ধারা, বাঘেলখণ্ডের ত্রিপুরী, বুন্দেলখণ্ডের খর্জ্জুরবাহক, যুক্তপ্রদেশের কান্যকুব্জ এবং দিল্লী ও আগ্রার বিস্তৃত অংশে বিস্তার লাভ করেছিল। এই সব শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বহু আগে অর্থাৎ অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে গৌড়ীয় শিল্পরীতির জন্ম হয়। এর উদ্ভবের পেছনে মৌল কারণ ছিল গৌড়রাজ্যের রাষ্ট্রীয় উন্নতি। আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে বপ্যাটপুত্র গোপাল সিংহাসনে বসায় বাংলাদেশে শান্তি, স্থিতি ও প্রগতির এক নবযুগের সূচনা হয়; যা অনির্বাণ শিখায় প্রজ্জ্বলিত ছিল একাদশ শতক অবধি। বিশেষ করে অষ্টম ও নবম শতকে ধর্মপাল ও দেবপাল শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যে শক্তিশালী বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে শিল্প উদ্ভবের পরিবহ তৈরী হয়। পাল বংশের স্থায়িত্ব চারশত বছর হলেও গৌড়ীয় শিল্পরীতি সমানভাবে চলেনি। অর্থাৎ কখনো উৎকর্ষ আবার কখনো অপকর্ষের দোলাচল দেখা গিয়েছিল। রাখালদাসের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া লেখযুক্ত মূর্তিগুলির উপর। এগুলির মধ্যে শতকরা নব্বইটি বৌদ্ধমূর্তি এবং শতকরা তিরিশটি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি কোনও না কোনও লেখযুক্ত। কোনও মূর্তিতে রাজার নাম, প্রতিষ্ঠাতার নাম ও তারিখ, কোনটিতে রাজার নাম ও তারিখ বাদ দিয়ে কেবল দাতার নাম উৎকীর্ণ। যে সমস্ত মূর্তিতে রাজার নাম ও তারিখ বাদ দেওয়া আছে, প্রায় ক্ষেত্রেই সেই তারিখ কোন অব্দের নয়, সামান্য দু-চারটি ক্ষেত্রে কোনও অব্দের তারিখ পাওয়া গেছে, যেমন একটিতে আছে 'শ্রীদেবপালদেব রাজ্যে সম্বৎ ৩৫' এবং এ থেকে মূর্তিটি কোন শতকের কোন দশকে তৈরী হয়েছিল তা বোঝা যায়।

পাল শাসনের দীর্ঘ চারশো বছর বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পালরাজাদের শক্তিশালী ও সুসংহত শাসনকালে বাংলায় শুধু রাষ্ট্রীয় ঐক্যই নয়- রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি– জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই এক নবযুগের সূচনা হয়। পালযুগ বাংলার ইতিহাসে প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যুগ। এই সময় উদ্ভূত গৌড়ীয় শিল্পের যেসব প্রাচীন মূর্তি বা শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে রাজার নাম বা তারিখ নেই, কেবল দাতার নাম বা মন্ত্র উৎকীর্ণ আছে। এগুলি থেকে প্রাচীন বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তন ও বর্তমান বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়। এর ফলে ঐগুলি পাল বা সেন বংশের কোন রাজার আমলে তৈরী হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় বলেই গৌড়ীয় শিল্পরীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা স্থির করা সম্ভব হয়েছে।

পালবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রিঃ) পর বাংলার ইতিহাসে এক ঘোরতর দুর্যোগের সৃষ্টি হয় এবং তা স্থায়ী হয় প্রায় দেড়শ বছর। এই সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়– আত্মকলহ, গৃহযুদ্ধ, হত্যা, গুপ্তহত্যা, ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন, দুর্বলের ওপর সবল বা দরিদ্রের ওপর ধর্মীয় অত্যাচার, নৈরাজ্য ও অরাজকতা ছিল বাংলার নিত্যদিনকার স্বাভাবিক নিয়ম। দেশে কোন সুস্থ বা স্থায়ী প্রশাসন না থাকায় পেশীশক্তিই শেষকথা ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানবদেব মাত্র আট মাস পাঁচ দিন রাজত্ব করেন। এই সময় কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মন বাংলা আক্রমণ করে যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এই পর্বে বাংলায় পাঁচটি পৃথক পৃথক রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল– কজঙ্গল (রাজমহলের কাছে), পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তমলুক) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ)। বাংলার এই সময়কার পরিস্থিতিকে বলা হত মাৎস্যন্যায়। বাংলার জাতীয় জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ[১৩] গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসালে বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বাংলাতে শান্তি ফিরে আসে। মাৎস্যন্যায়ের পূর্বে এই দেশে যিনি রাজা ছিলেন, তাঁর রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি কোন বংশজাত তার কিছুই জানা যায় না। রাখালদাস লিখেছেন, 'গয়া ও ভাগলপুর জেলায় যে সমস্ত শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানতে পারা যায় যে, মগধের গুপ্তবংশজাত আদিত্য সেন নামক একজন রাজার রাজত্বকালে ৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ও পরে এই দুইটি জেলা তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে আদিত্য সেনের রাজ্যকালে বিহারে শাহপুর গ্রামে একটি সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্তিটি

এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু শিলালেখের ছায়া আছে। আদিত্য সেনের বংশধর দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত আরা জেলায় দেওবনারক গ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের একটি স্তম্ভে ওই রাজার একটি শিলালেখ আছে। শাহপুর ও দেওবনারকের শিলালেখের অক্ষর দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় খ্রিষ্টাব্দে সপ্তম শতকের শেষভাগে ও অষ্টমের প্রথমভাগে উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে অক্ষরের আকার কীরূপ ছিল। এইরূপ আকারের অক্ষর যে সমস্ত মূর্তির লেখে দেখিতে পাওয়া যায় যে মূর্তিগুলি সপ্তম ও আষ্টম শতকের। বুদ্ধ গয়া, কুক্কুট বিহার বা কুরকিহার নালন্দা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থে সহস্র বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম শতকের মূর্তি সংখ্যায় অতি অল্প। উদাহরণস্বরূপ এই সময়ের তিন চারিটি মূর্তির চিত্র প্রকাশিত হইল; এই চিত্র হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খ্রিষ্টাব্দের সপ্তম ও অষ্টম শতকে গৌড়রাজ্যে শিল্পের কী ঘোরতর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল'।[১৪] সপ্তম ও অষ্টম শতকে নির্মিত পাথরের মূর্তিগুলি লক্ষ্য করলে উপলব্ধি হয় যে, এই পর্বে ভাস্করের অনুপাদ জ্ঞানের তীব্র অভাব এবং দেবদেবীর অঙ্গে বৈচিত্র্য বা অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তোলার বিফলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই রকমভাবে ধাতু শিল্পে ও তার দৈনতা প্রকাশ পায়। শিল্পের দৈন্যতা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে বাংলার বাইরে বারানসী থেকে বা চুনারের থেকে বেলে পাথরের বৌদ্ধ মূর্তি এনে বাংলাদেশে নিজেদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হত। এই মূর্তিগুলি ছিল কাশী বা সারনাথের শিল্পীদের তৈরী। পালবংশের দ্বিতীয়রাজা গোপালপুত্র ধর্মপালের সমগ্র জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয়িত হওয়ায় তাঁর সময়ে গৌড়ীয়-শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। ভারতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের রচয়িতা লামা তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, গৌড়রাজ্যে ধীমান ও বীতপাল নামক দু'জন প্রতিভাধর শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তারানাথের মতে, পালসম্রাট ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন ধীমান। পিতার মতো বীতপালও বঙ্গে তাঁর কর্মকাণ্ড স্থাপন করেন। এঁদের হাতের কাজ ছিল অসাধারণ। এই দুই প্রতিভাধর শিল্পীর শৈল্পিক নৈপুণ্যে গৌড়বঙ্গে শিল্পকলায় বহু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দৃষ্ট হয়। তবে এই অবস্থা নবম শতকে পাল্টে গিয়ে গৌড়ীয় শিল্প হঠাৎ অভূতপূর্ব সৌন্দর্য লাভ করে, যার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। রাখালদাস লিখেছেন,

> "...দেবপাল এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া দেশে যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ফলে গৌড়রাজ্যের কেন্দ্রে নতুন শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।"[১৫]

ধর্মপালের সময় তাঁর জীবনব্যাপী যুদ্ধে রত হওয়ার কারণে গৌড়ীয় শিল্পের বিশেষ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। সপ্তম শতকের শেষে ও অষ্টম শতকের প্রথমে গৌড়ীয় শিল্পে সামান্য পরিবর্তন সূচিত হলেও তা শিল্পজগতে নবজীবনের দ্যোতনা বহন করেনি। কারণ রাখালদাসের মতে,

> "তখনও গৌড় রাজ্যের শিল্পী গুপ্তযুগের আদর্শ নকল করিয়াই নিজের কাজ শেষ হইয়াছে মনে করিত, নূতনত্বের প্রয়াস বা চিন্তাশক্তির বিকাশ তাহাদের কার্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়রাজ্যবাসী তখনও বাণিজ্যে অথবা রাজ্য-বিস্তৃতিতে ধনশালী হইয়া উঠে নাই; ভাস্কর, শিল্পী অথবা চিত্রকরকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবার শক্তিও তাহাদের হয় নাই।"[১৬]

তবে দেবপালের সময় বাংলায় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার কারণে গৌড়ীয়শিল্প যে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল তার ফলে এই শিল্প-প্রয়াস অন্য কোন শিল্পকে অবলম্বন না করে একটি বিশেষ আদর্শ অবলম্বন করে এবং এক নতুন শিল্পরীতির জন্ম দেয়– যা গৌড়ীয় শিল্পরীতি নামে পরিচিতি লাভ করে।

গৌড়ীয় শিল্পের প্রথম যুগে পাথরের মূর্তির পাশাপাশি মাটির মূর্তি গড়িয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হত। কলকাতার জাদুঘরে এই রকম দুটি পোড়ামাটির মূর্তি রক্ষিত আছে- প্রথমটি হল লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি। এর বামহাতে সনালোৎপল ও ডানহাত অভয়মুদ্রায় অবস্থিত। মূর্তিটির চালিতে যেসব বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত আছে তার অক্ষর থেকে বোঝা যায় মূর্তিটি নবম শতকের তৈরী। দ্বিতীয় পোড়ামাটির মূর্তিটিও বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত এবং কলকাতার জাদুঘরে রক্ষিত আছে। রাখালদাসের মতে,

> "পোড়ামাটির এই দুইটি মূর্তি শিল্পের নিদর্শন হিসাবে অতি উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য এবং ইহার সহিত মৈত্রেয়, বজ্রপাণি ও আচার্য গুনমতির সিততারামূর্তির তুলনা করা যাইতে পারে।"[১৭]

নবম শতকের তুলনায় দশম শতকে গৌড়ীয় শিল্পীর আদর্শের পরিবর্তন হতে শুরু করে অর্থাৎ শিল্পীর আদর্শের আপেক্ষিক অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শতকে বিশেষ করে প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপাল দেবের রাজত্বকালে গৌড়ীয় শিল্পের আদর্শ প্রথম যেভাবে ক্ষুন্ন হতে দেখা যায় তা ক্ষণিকের নয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। দশম শতকে বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারা যায়, গৌড়ীয় শিল্পের প্রত্যেক কেন্দ্রে মূর্তি তৈরীর সময় শিল্পীরা একটা আদর্শ সামনে রেখে কাজ করত। এই আদর্শকে বলে শিল্পীর মানসিক আদর্শ। শিল্পীর মনে কাম্যমূর্তির যে আদল গড়ে ওঠে মূর্তিগড়ার সময় শিল্পী সম্পূর্ণভাবে তা ফুটিয়ে তুলতে পারে না। শিল্পীর মনের সেই সৌন্দর্য বা উদ্ভূত আদলের সাথে গঠিত মূর্তির যে তফাৎ থাকে প্রকৃত শিল্পী পৌনঃপুনিক চেষ্টার ফলে তা সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু শিল্পী যখন খাদ্যাভাব বা রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, অনাচার, রাজদ্রোহ প্রভৃতির কবলে পড়ে তখন বহুচেষ্টা সত্ত্বেও আর শিল্পের উৎকর্ষ ঘটাতে পারে না। এই রাষ্ট্রীয় অশান্তি দীর্ঘতর হলে শিল্পের সৌন্দর্যও স্বাভাবিকভাবে ক্ষুন্ন হতে থাকে। দশম শতকে গৌড়ীয় শিল্পের ভাগ্যে ঠিক এই পরিণতিই জুটেছিল। রাখালদাস লিখেছেন, ‘ফলে এদেশের একস্থানের একই যুগের মূর্তি দেখিলে মনে হয় যে, সেগুলি একই ছাঁচে ঢালা।’[১৮] পালযুগে বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন বিহারের বিভিন্ন স্থান থেকে যে-সব বুদ্ধ-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির অবয়বে পরিমিতিবোধের অভাব, হাতের তুলনায় পদদ্বয়ের হ্রস্বতা, দেহের উপরিভাগের তুলনায় নিম্নভাগের খর্বতা এবং সর্বাঙ্গে লালিত্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পদদ্বয়ের অস্বাভাবিক দীর্ঘতাও দেখা যায়। মহেন্দ্রপালদেবের সময় থেকে বিহারের হাজারিবাগ জেলার ইটখৌরী গ্রাম থেকে যে সিততারা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তাতে শুধু শিল্পীর আদর্শের বিকৃতি নয়, সৌন্দর্য-জ্ঞানেরও বড় অভাব ছিল। তবে সুখের বিষয়, এই শিল্পাদর্শবোধের অভাব গৌড়রাষ্ট্রের সর্বত্রই সমানভাবে সংক্রামিত হয়নি। দশম শতকের তৃতীয় পাদে যে-সব বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে তাতে ‘দেবমূর্তির মুখশ্রী, শিল্পীর পরিমাণ-জ্ঞান ও সর্বাবয়বের লালিত্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দশম শতকের তৃতীয় পাদে কোনও অজ্ঞাত কারণে অবনতির পরে আবার গৌড়ীয় শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল’।[১৯] এই উন্নতির কারণ কি ছিল তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায়, পালবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মহীপাল দশম শতকের তৃতীয় পাদের কোনও এক সময়ে সিংহাসনে বসেন। অর্থাৎ পালবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই গৌড়দেশে শিল্পোন্নতির দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়েছিল।

এই দ্বিতীয় যুগে গৌড়ীয় শিল্প মগধ হতে ব্রহ্মপুত্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই যুগের শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল- সমস্ত প্রদেশের প্রাদেশিক আদর্শের সমন্বয়ে এক নতুন শিল্পাদর্শের জন্মলাভ, যে সমন্বয় ভারতের সুদীর্ঘ শিল্পেতিহাসেও বিরল। এই সময়কার শিল্পাদর্শের দীর্ঘায়ুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্রাদেশিকতা-বর্জন। গৌড়ীয় শিল্পের এই নবযুগের স্থায়িত্ব দশম শতকের শেষপাদ হতে একাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড়ীয় শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে রাখালদাস স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন,

> “দশম শতকের প্রথম পাদে গৌড়ীয় শিল্পে যে অবসাদ আসিয়াছিল, দ্বিতীয় পাদে তাহা ক্রমশ লুপ্ত হইতেছিল, কিন্তু তৃতীয় পাদে তাহার পরিবর্তে নবযৌবনোঙ্কুরে তাহা নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছিল। দশম শতকের শেষভাগে নবজীবন লাভ করিয়া গৌড়ীয় শিল্প যে-আকার গ্রহণ করিল, তাহা শিল্পের ব্যাপ্তির ইতিহাসে নূতন। নবজাত গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসে এই নবজীবনের যুগ ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় গৌরবময় যুগ।”[২০]

গৌড়ীয় শিল্পের পুনরুত্থান শুধু প্রাদেশিক সমন্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গৌড়ীয় শিল্প এই সময় বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল। গৌড়ীয় শিল্পের আদিপর্বে বৈষ্ণব ও হিন্দুমূর্তি তৈরীর নজির তেমন একটা ছিল না। এই যুগে বুদ্ধমূর্তির আধিক্য থেকে স্পষ্ট হয় মগধে, গৌড়ে ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অধিকতর ছিল। তবে দশম শতকের শেষপাদ হতে বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং বুদ্ধ গয়া ও নালন্দা ছাড়া অন্যকোন বৌদ্ধতীর্থে বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কারের ঘটনা বিরল। এই অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ভরকেন্দ্র মগধ হতে অপসারিত হয়ে পালরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমিতে স্থানান্তরিত হয়। এই নবজীবনের কালে গৌড়ীয় শিল্পের প্রধান লক্ষণ ছিল সাম্য ও দৈহিক আকারের অনুপাত। বৌদ্ধশিল্প, হিন্দুশিল্প ও জৈনশিল্প স্বতন্ত্র হলেও গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসে নবজীবনের কালে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 295 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিল্পশাস্ত্রের ধারায় এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের আদর্শ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। মহীপালের মৃত্যুর পরে আর্যাবর্তে পালবংশের রাজাদের প্রভাব হারানোর সাথে সাথে গৌড়ীয় শিল্পের প্রভাবও কমতে শুরু করে এবং সেই স্থান দখল করেছিল দক্ষিণী-শিল্প। ফলে গৌড়ীয় শিল্পে প্রতিফলিত হয় দাক্ষিণাত্য-প্রভাব। রাখালদাস লিখেছেন,

> "বৌদ্ধরাজা রামপাল জগদ্দল মহাবিহার সংস্কার করাইয়া তাহাতে অনেক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এই রামপালদেবের রাজ্যের দ্বিতীয় বৎসর হইতে গৌড়ীয় শিল্পে- বিশেষত স্ত্রী-মূর্তিতে- দাক্ষিণাত্য-প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দাক্ষিণাত্য বা কর্ণাটক প্রভাব তৃতীয় বিগ্রহপাল অথবা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বে গৌড়ীয় শিল্পে অনুভূত হইয়াছিল কিনা তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে মিথিলা ও পূর্ববঙ্গে কর্ণাটক-রাজ্যে প্রতিষ্ঠার অতি অল্প পরেই যে গৌড়দেশের শিল্পে দাক্ষিণাত্য বা কর্ণাটক প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।"[২১]

গৌড়ীয় শিল্প এই সময় দক্ষিণী-শিল্পে প্রচলিত উরুস্থলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অলঙ্কার ও বস্ত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি অর্থাৎ কাপড়ের ভাঁজের দাগ পরিলক্ষিত হয়। এই রীতি মুসলমান বিজয়ের কিছু পূর্বে দেখা গিয়েছিল। গৌড়ীয় শিল্পরীতির এটাই শেষ উৎকর্ষের যুগ। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে কর্ণাটরীতির প্রভাব থাকলেও উরুর অস্বাভাবিকতা কমিয়ে আনা হয়। সেন রাজাদের আমলেও গৌড়ীয় শিল্পে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলায় মুসলিম বিজয় হলে শিল্পীরা আর পাথর খোদাই করে মূর্তি বানাতো না। এর অন্যতম কারণ ছিল পূর্ববঙ্গে পাথরের দুষ্প্রাপ্যতা আর মুসলিমদের অনাচার। সুতরাং শিল্পীকে বাধ্য হয়ে মাটি অথবা কাঠের মূর্তি গড়তে হত। রাখালদাস লিখেছেন,

> "With the end of the twelfth century A. D. i.e., with the Muhammadan conquest of the eastern provinces of Northern India, artistic activity seems to have come to an end in Magadha and Gauda".[২২]

ত্রয়োদশ শতকে গৌড়ীয় শিল্পশৈলীর অবস্থা মামুলিভাবে বেঁচে থাকার ফলে যেন আরও নিষ্প্রাণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকের অভাবের সঙ্গে যখন বখতিয়ার খলজীর হাতে ওদন্তপুরী বা উদ্দণ্ডপুর ও নালন্দা ধ্বংসের ঘটনা যুক্ত হল তখন যেন গৌড়-মগধের শিল্পকলার শেষদশা এবং বাস্তবিক তখন ভাস্কর্য কর্মের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেল; বিহার, এমনকি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে সেনরা তখন পূর্ববঙ্গে, রাজনৈতিকভাবে অবনতির প্রান্তবর্তী, শিল্পীদের অবস্থাও শোচনীয়, বিহার থেকে শ্লেটপাথর ও ব্যাসল্ট পাওয়ার পথ বন্ধ, ফলে ভাস্করদের নির্ভর করতে হচ্ছে স্থানীয় দারু-উপাদানের উপর, যার প্রমাণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া ত্রয়োদশ শতকের কল্পনারিক্ত অপদৃষ্টমানের দারু-ভাস্কর্যে।[২৩]

পাল আমলের গৌড়ীয় শিল্পে যে সহজ আড়ম্বরহীন অথচ গহন ও আত্মসমীক্ষণের বৈভব নিহিত ছিল, সেন রাজাদের আমলে তাতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে- '...সংযম অপেক্ষা উপভোগ, শৌর্য অপেক্ষা বিলাসই যেন তার মূল আদর্শ'।[২৪] সেনযুগে মূর্তির শীর্ণদেহে সংহত চিক্কনের পরিবর্তে যে মাংসল পেলবতার সন্নিবেশ ঘটল, তা পূর্বতন যুগের থেকে বেশ আলাদা। তা অলঙ্কার ও কারুকার্যের বাহুল্যে, পার্শ্বমূর্তি সমূহের দেহ-বিভঙ্গে যেন কাব্যিক উচ্ছ্বাসের উৎসার ঘটায়। তবে এই লালিত্য ও মাধুর্যবোধ ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। একটা দীর্ঘ প্রসারিত যুগ, যা ছিল জ্ঞান ও অনুশীলন, উপলব্ধি ও স্থিতি প্রজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তার অবসানকাল সূচিত হল। গৌড়বঙ্গে যে ভাগ্যলক্ষ্মী পালশক্তিকে অবলম্বন করে বাংলাকে মাৎস্যন্যায় থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেন যুগের দুঃসময়ে তাঁকে আর সক্রিয় হতে দেখা যায় না- বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে বাংলার সেনযুগ ও তার শিল্পগরিমা ভূলুণ্ঠিত হল। আর এর ফলে গৌড়ীয় শিল্পের প্রাণভোমরাও নির্গত হল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময়ে বসে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকীর্তি সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন, সেই সময় ভারতীয় শিল্প গৌরবের ইতিহাসচর্চা স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে। আনন্দ কুমারস্বামী'র মতো প্রোথিতযশা যে ক'জন শিল্প-প্রাজ্ঞ ভারতবর্ষ ও ভারতকৃষ্টির প্রভাবাধীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আনুপূর্বিক শিল্পেতিহাস রচনার কাজ করেছেন, তাঁরাও রাখালদাসের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। রাখালদাসের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফসল তাঁদের পাথেয় ছিল। কেননা রাখালদাস শিল্পেতিহাসচর্চার যে পথ সৃষ্টি করেছিলেন উত্তরপর্বে বহু শিল্প বিশেষজ্ঞ সেই পথকে আরো প্রশস্ত

করেছেন মাত্র। সামগ্রিক বিচারে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শতাব্দীর (বিংশ) সূচনাতে প্রথম সারির ভারতশিল্পের ঐতিহাসিক রূপে নন্দিত, শতাব্দীর অন্ত্যপর্বেও তাঁর সেই আসন অক্ষুন্ন ও অবিসংবাদিত।[২৫]

Reference:

১. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার (সম্পাদিত), 'ভূমিকা', *শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,* শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৯৯০
২. Roy Niharranjan, "The Orient, Orientalism and Orientalia", *The East and the West* in Indian History, সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ, বিশ্বভারতী, নভেম্বর, ১৯৮০; O. P. Kejariwal, The Asiatic Society of Bengal And The Discovery of India's Past, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ১৫২-১৫৩
৩. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, "স্বদেশ-সন্ধানে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র", *ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৩০-৩১
৪. তদেব, পৃ. ২
৫. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার (সম্পা.), "ভারতশিল্পের ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস*", শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,* শরৎ সমিতি, পৃ. ১৭৪
৬. তদেব, পৃ. ১৭৪
৭. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, "বহুমুখী স্বদেশ-সন্ধিৎসা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়", *ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* তদেব, পৃ. ৮৪
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, "শিল্পের আদর্শ", *সচিত্র শিশির,* ১৩৩০ মাঘ।
৯. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ),* জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৯
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, "গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস", *প্রবাসী,* ১৩৩৪ মাঘ।
১১. গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার, *বাংলার ভাস্কর্য,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২
১২. *প্রবাসী,* মাঘ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৩৮। রাখালদাস লিখেছেন, 'অনেকদিন ধরিয়া মালমশলা সংগ্রহ হইবার পরে এখন গৌড়-দেশের প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস সংকলন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে'।
১৩. এফ. কীলহর্ণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখের মতে, 'প্রকৃতিপুঞ্জ' কথার অর্থ হল দেশের সমগ্র জনসাধারণ এবং তারাই সমবেতভাবে গোপালকে বাংলার রাজা নির্বাচিত করে। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক প্রমোদলাল পাল, ড. নীহাররঞ্জন রায়, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আব্দুল মোমিন চৌধুরী প্রমুখের মতে, 'প্রকৃতি' কথার অর্থ হল সামন্তরাজা বা দেশের নেতৃস্থানীয় কর্মচারীবৃন্দ এবং তারাই সম্মিলিত হয়ে গোপালকে রাজা নির্বাচিত করে।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, "গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস", *প্রবাসী,* ১৩৩৪ মাঘ।
১৫. তদেব।
১৬. তদেব।
১৭. *প্রবাসী* ১৩৩৫ বৈশাখ, মাঘ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত চিত্র।
১৮. প্রবাসী ১৩৩৫ আষাঢ়।
১৯. তদেব।
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, "গৌড়ীয় শিল্পের পুনরুত্থান", *প্রবাসী* ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ।
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য-প্রভাব, *প্রবাসী* ১৩৩৭ বৈশাখ।
২২. Banerji, RD, "Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture", *Archaeological Survey of India,* New Delhi, 1998, p. 41

২৩. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, “ভারত শিল্পের ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস”, পৃ. ১৮৯

২৪. গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার, *বাংলার ভাস্কর্য,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ২০৩

২৫. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, ‘ভারত শিল্পের ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস’, পৃ. ২০৩